১ম
পর্ব
দ্বীন কায়েম
একটি কৌশলগত পর্যালোচনা
الحكمة
আল হিকমাহ
মিডিয়া
আবু আনওয়ার আল হিন্দি
(হাফিজাহুল্লাহ)

দ্বীন কায়েম

একটি কৌশলগত পর্যালোচনা

১ম পর্ব

আবু আনওয়ার আল হিন্দি (হাফিজাহুল্লাহ)

পরিবেশনায়

আল হিকমাহ মিডিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

যেকোন সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা। একবার সমস্যাকে চিহ্নিত করার পর করণীয় হল সেই সমস্যা সমাধানের একটি পন্থা বা পদ্ধতি তৈরি করা এবং তারপর সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা।

যায়নিস্ট-ক্রুসেডার এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের দালালদের সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে ১৯২৪ সালে উসমানীদের পতন ঘটে। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ – বিশ্ব ময়দানে তার কর্তৃত্ব সম্পূর্নভাবে হারিয়ে ফেলে এবং কুফফারের বহুমুখী আক্রমনের সামনে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত ও অসহায় হয়ে পড়ে।

যার ফলশ্রুতিতে কিছুদিন পর ফিলিস্তিন ও পবিত্র আল-আক্বসা মাসজিদ ইহুদিদের হস্তগত হয়। দুঃখজনকভাবে এই মহাবিপর্যয়ে পতিত হবার পরও মুসলিম উম্মাহর বিশাল অংশ মূল সমস্যাকে এবং সমস্যা নিরসনে করণীয় কি-তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়।

তবে কিছু দল তথা আন্দোলন সঠিক ভাবে সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং তার সমাধানে করণীয় কি – এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও সেটা অনুযায়ী কাজ করতে সচেষ্ট হয়। তারা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যে মুসলিমদের দুর্দশার কারণ খিলাফাহ না থাকা এবং উম্মাহর মধ্যে জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা।

তারা সঠিকভাবে এও চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় যে এ সমস্যাবলী থেকে উত্তরণের পথ হল ঐক্যবদ্ধ হয়ে খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

শেষোক্ত কাজটি – অর্থাৎ খিলাফাহ কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে, কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে – এই প্রশ্নের জবাব একেক দল একেক ভাবে দিয়েছে। আর আমাদের এই লেখার আলোচ্য বিষয় এই শেষোক্ত প্রশ্নটিই।

আমরা এই লেখাটিতে চেষ্টা করবো খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল পদ্ধতি বা মানহাজ বর্তমানে কিংবা নিকট অতীতে অনুসৃত বা প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের। আমরা বিশেষ করে ইখওয়ানী/জামাতী ধারা, হিযবুত তাহরীর, বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদী তানজীম, তাকফির ওয়াল হিজরাহ [জামাতুল মুসলিমীন]/GIA/জামাতুল বাগদাদী [আইএস/আইএসএস], এবং শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ তথা তানজীম আল –ক্বা'য়িদাতুল জিহাদের পদ্ধতির দিকে নজর দিবো।

একইসাথে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো, শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ'র প্রস্তাবিত এবং অনুসৃত ধারাই সর্বাধিক বাস্তব সম্মত, কার্যকরী, সফল এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ। আমাদের এই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা হবে কৌশলগত বা স্ট্র্যাটেজিক। একারণে এক্ষেত্রে আমরা এই আলোচনায় এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর শার'ঈ বিশ্লেষণ এবং দালীলভিত্তিক আলোচনায় যাবো না।

এই দল বা পদ্ধতিগত ধারার বাইরে আমরা আরো দুটি ধারা দেখতে পাই যারা দাবি করে তারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ ধারা দুটো হল – ১) তাবলীগ জামাত এবং ২) সালাফি দাওয়াহ [শায়খ আলবানীর প্রচারিত]। আমরা এই দুটো ধারা নিয়ে কোন আলোচনা করবো না। বস্তুত আক্বীদা এবং উসুলী ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, "খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উম্মাহর কি করনীয়" এ প্রশ্নের জবাবে, এই দুটো ধারা মূলত একই ধরণের জবাব দেয়।

উভয়েই বলে তারবিয়্যাহর [শিক্ষার] মাধ্যমে পুনরায় খিলাফাহ ফিরে আসবে। তাবলীগ জামাত বলে, সব মুসলিম যদি সুন্নতী পোষাক পড়ে, সুন্নতি আমল করে, জামাতে সালাত আদায় করে, এবং সর্বোপরি সাচ্চা মুসলিম হয় যায় তবে খিলাফাহ অটোমেটিক ফেরত চলে আসবে। অন্য দিকে সালাফি দাওয়ার বক্তব্য হল, সব মুসলিম যদি সঠিক আক্বিদা গ্রহণ করে, শিরক-বিদ'আ-কুফর থেকে বিরত হয়, এবং দ্বীনের ব্যাপারে সালাফ-সালেহীনের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- তা গ্রহণ করে তাহলে অটোমেটিক খিলাফাত ফিরে আসবে।

আমরা সকল মুসলিম দলকেই শ্রদ্ধা করি, এবং স্বীকার করি সকল মুসলিম জামাতের মধ্যে কল্যাণ আছে। কিন্তু একই সাথে আমরা বাস্তবতার দিকেই চোখ রাখি এবং আবেগের আতিশয্যে বিচার-বুদ্ধির ব্যবহার বন্ধ করি না। তাই তাবলীগ জামাত এবং সালাফি দাওয়ার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই আমরা বলি, এ দুটো পদ্ধতি সমাজ সংস্কারের জন্য একটা পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে, কিন্তু কখনোই খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হতে পারে না। শুধুমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। না মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে আর না সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এরকম কোন নজীর আছে। বাস্তব দুনিয়া এভাবে কাজ করে না।

খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রস্তাবিত পদ্ধতি (মানহাজ):

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আমরা এখানে পাঁচটি পদ্ধতি তথা মানহাজের দিকে নজর দেবো। সেগুলো হলঃ

১) ইখওয়ানুল মুসলিমীন/জামাতে ইসলামীর পদ্ধতি

২) হিযবুত তাহরীরের পদ্ধতি

৩) বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদি জামাতের পদ্ধতি [হামাস, লস্কর-ই-তাইয়্যেবা, জেএমবি, এলআইএফজি ইত্যাদি]

৪) তাকফির ওয়াল হিজরাহ [জামাতুল মুসলিমীন], GIA, জামাতুল বাগদাদী [আইএস/আইএসএস] - ইত্যাদি দলের পদ্ধতি

৫) তানজীম আল ক্বাইদাতুল জিহাদের পদ্ধতি

এই ধারাগুলোর প্রথম দুটি ধারা সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা। আর পরের তিনটি হল সশস্ত্র আন্দোলনের ধারা। এ ফোরামের সদস্যরা সবাই এই ধারাগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাই প্রতিটির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই। পারস্পরিক পর্যালোচনার জন্য আমরা অল্প কথায় প্রতিটি পদ্ধতির মূল নির্যাস তুলে ধরছি।

১) জামাতি-ইখওয়ানি ধারাঃ মূলত শায়খ হাসানুল বান্না এবং আবুল আলা মওদুদীর রাজনৈতিক ধারণার উপর গড়ে ওঠা। যদিও এ দুটি দলই দাবি করে তারা শায়খ সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহর মতাদর্শও অনুসরণ করে, তবে শায়খ সাইদ কুতুবের লেখনীর সাথে পরিচিত যে কোন পাঠক, এই দাবির অসত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারবেন।

এই ধারার মূল লক্ষ্য হল এমন একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যা হবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক। এই আন্দোলনের একটি শক্তিশালী আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি থাকবে। আন্দোলনের কর্মীরা সমাজের মধ্যে গভীরভাবে "এমবেডেড" বা প্রোথিত থাকবেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল অংশের সাথে তারা জড়িত থাকবেন, ফলে এই দল এবং আন্দোলনকে সমাজ থেকে নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন হবে। দলের সদস্যরা তাদের নিজস্ব সামাজিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আন্দোলনের কাজে লাগাবেন। সমাজের ভেতরে আরেকটি সমাজ গড়ে তোলা হবে যারা দাওয়াহ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হবেন। উপযুক্ত সময়ে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা হবে।

এই দলের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠবে। এদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে। আর মূল নেতৃবৃন্দ যে রাজনৈতিক কর্মসুচি ও পন্থা গ্রহণ করবেন তাই শাখাগুলো অনুসরণ করবে। মুলত একটি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি।

২) হিযবুত তাহরীরঃ তাকিউদ্দীন আন-নাবহানীর মতাদর্শের উপর গড়ে ওঠা। দলের সদস্যরা দাওয়াহর মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবে, এবং খিলাফাহর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উম্মাহকে অবহিত করবে। দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে যাতে উম্মাহ খিলাফাহর দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় সামরিক বাহিনীর কাছে "নুসরাহ" চাওয়া হবে।

এবং সামরিক বাহিনীর "নুসরাহ" [সাহায্য] পেলে ক্যু-র মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হবে এবং খিলাফাতের ঘোষনা দেয়া হবে। একটি মূল নেতৃত্ব থাকবে যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শাখার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রন করবে এবং পলিসি ঠিক করবে। এটিও একটি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি।

৩) বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদি জামাতের পদ্ধতি (হামাস, লস্কর-ই-তাইয়্যেবা, জেএমবি, মরো ইসলামী লিবারেশান ফ্রন্ট, এলআইএফজি ইত্যাদি): নিজ নিজ মুসলিম ভূখণ্ডের ত্বগুত ও মুরতাদীন শাসকগোষ্ঠীকে কিংবা কাফির আসলি দখলদারকে জিহাদের মাধ্যমে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করা এবং শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। "নিকটবর্তী শত্রুর" বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

এখানে উল্লেখ্য 'হামাস', 'লস্কর এ তাইয়্যেবার' সূচনা মূলত এই আদর্শের উপর হলেও, তারা পরবর্তীতে এই আদর্শ ত্যাগ করেছে, গণতান্ত্রিক ধারায় অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই ধারাটি প্রায় বিলুপ্ত।

৪) তাকফির ওয়াল হিজরাহ (জামাতুল মুসলিমীন), GIA, জামাতুল বাগদাদী (আইএস/আইএসএস)-ইত্যাদি দলের পদ্ধতিঃ একটি ভূমি দখল করা যা "সেফ যোন" [safe zone] হিসেবে কাজ করবে। একজন আমীর নিযুক্ত করে তাকে "খালিফাহ" ঘোষণা করা। তার নেতৃত্বে "নিকটবর্তী শত্রুর" বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে অঞ্চল দখল করা, এবং সেখানে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে বাই'য়াহ দাবি করা এবং তাদের নিযুক্ত খালিফাহকে বাই'য়াহ দেয়া সকলের উপর ওয়াজিব মনে করা এবং বাই'য়াহ যারা দেবে না তাদের মুরতাদীন-মুনাফিক্বীন মনে করা এবং তাদের রক্ত হালাল করা।

ষাটের দশকের শেষ দিকে মিশরে আল তাকফির ওয়াল হিজরাহ বা জামাতুল মুসলিমীন এই মতাদর্শ প্রচার করে। তারা শুকরি মুস্তফাকে খলিফাহ এবং নিজেদের মুসলিমদের একমাত্র বৈধ জামাত দাবি করে এবং নিজেদের দলের বাইরে বাকি সব মুসলিমকে তাকফির করে।

তাদের পরিকল্পনা ছিল ইয়েমেনের পাহাড়ি অঞ্চলকে নিজেদের খিলাফাতের সেফ জোন হিসেবে ব্যবহার করা এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন আক্রমণ চালিয়ে অন্যান্য অঞ্চল দখল করা। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি আলজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় GIA একই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করে। তারা খিলাফাহ ঘোষণা করে এবং নিজেদের একমাত্র বৈধ জামা'আত দাবি করে, ব্যাপকভাবে তাকফির করে এবং মুসলিমদের হত্যা করে। বর্তমানে জামাতুল বাগদাদী [আইএস/আইএসআইএস] একই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

তারা নিজেদের খিলাফাহ দাবি করেছে, নিজেদের একমাত্র মুসলিম জামাত দাবি করেছে, সব মুসলিমের জন্য তাদেরকে বাই'য়াহ দেয়া ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। যারা তাদেরকে বাই'য়াহ দেয় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জামাতুল বাগদাদী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যারা বাই'য়াহ দেয় না তাদের জান-মাল-সম্মান হালাল মনে করে। ***এবং তাদের বিরোধিতাকারী সকল মুসলিমকে মুরতাদ মনে করে।***

মূলত এই পদ্ধতিটি হল, প্রথমে খিলাফাহ ও খালিফাহ ঘোষণা করা, তারপর এই ঘোষনাকে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। আর এই খিলাফাহ ঘোষণার ভিত্তিতে- ঘোষিত খালিফাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে মুসলিমদের মধ্যে ঈমান ও কুফরের বিচার করা।

৫) তানজীম আল-ক্বাইদাতুল জিহাদঃ দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা। একটি অগ্রগামী দল তৈরি করা যাদের কাজ হল "সাপের মাথা" তথা বৈশ্বিক কুফর শক্তির কেন্দ্র অ্যামেরিকাকে এবং পাশাপাশি অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিগুলোকে আক্রমণ করা। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি জামাত আছে তাদের সাথে মিলে কাজ করা।

এই সব দলকে একটি বিশ্বব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত করা। এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দ্বীনের শত্রুদের

বিরুদ্ধে ক্বিতাল করবে, এবং মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াহর কাজ চালাবে। মূল গেরিলা যুদ্ধ শুরুর আগে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে।

ক্ষেত্রবিশেষে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এরা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে [AQAP, AQIM , al-Shabab]। প্রতিটি শাখা মূল নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা মেনে চলবে। প্রয়োজনে অন্যান্য ইসলামি দলের সাথে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলা, দাওয়াহর কাজ চালানো, আঞ্চলিক ত্বগুত বা কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং যথেষ্ট ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ গঠন করা।

এবং একই সাথে মূল শত্রু অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমন চালিয়ে যাওয়া। একটি Asymmetric war of attrition – শক্তিক্ষয়ের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব, তথা অ্যামেরিকাকে জড়িয়ে ফেলা। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে অ্যামেরিকার সামরিক অভিযান চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করা।

যখন পশ্চিমা বিশ্ব এবং অ্যামেরিকা মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালানো এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের ত্বওয়াগীতকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে পড়বে - তখন শূরার মাধ্যমে, উম্মাহর সম্মতির ভিত্তিতে খিলাফাহ ঘোষণা করা। মূলত এটি দাওয়াহ ও জিহাদের পদ্ধতি। আগের পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতির পার্থক্য হল, এটি কোন আঞ্চলিক ভূমি দখলকে মূল উদ্দেশ্য মনে করে না।

এটি আঞ্চলিক সংঘর্ষের চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। গেরিলা যুদ্ধই যে উম্মাহর জন্য বাস্তবসম্মত একমাত্র পন্থা এটা স্বীকার করে এবং "দূরের শত্রু"(অ্যামেরিকার)'র উপর ফোকাস করে। এই মানহাজে কুফরের ইমামদের আগে ধ্বংস করাকে নিজেদের মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে।

খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রস্তাবিত পদ্ধতির (মানহাজ) কৌশলগত পর্যালোচনা

শায়খ উসামার পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বঃ

যেকোন পদ্ধতির দুটি অংশ থাকে। তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক। এমন হতে পারে একটি পদ্ধতি তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত অভিজাত, কিন্তু প্রায়োগিক দিক দিয়ে দুর্বল। এ মানহাজগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় যাবো না, আগ্রহী ভাইরা এ ব্যাপারে শায়খ আওলাকী রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ জসীমুদ্দিন রাহমানী ফাকাল্লাহু আশরাহসহ অন্যান্য উলেমা ও উমারাহগণের লেখা দেখতে পারেন।

আমরা এখানে ফোকাস করবো প্রায়োগিক দিকটাতে। বিশেষ করে, মনোযোগী পাঠক হয়তো এরইমধ্যে খেয়াল করেছেন, একমাত্র তানজীম আল-ক্বাইদাতুল জিহাদ এবং আঞ্চলিক মানহাজ ছাড়া বাকি সব পদ্ধতিতেই প্রথমে খিলাফাহ ঘোষণা [হিযবুত তাহরীর, জামাতুল বাগদাদী] কিংবা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল [ইখওয়ান/জামাত] এবং তার পর খিলাফাহকে বাস্তবতায় পরিণত করাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

একারণে "একবার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল কিংবা কোন ভূখন্ডে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর কি হবে" - আমরা চেষ্টা করবো, বর্ণিত প্রতিটি পদ্ধতির আলোকে এই প্রশ্নটির জবাব দিতে।

রাজনৈতিক পদ্ধতিঃ

প্রথমে আমরা প্রস্তাবিত রাজনৈতিক পদ্ধতি,

অর্থাৎ ইখওয়ানী/জামাতি এবং হিযবুত তাহরীরের দিকে নজর দিব। এ দুটি পদ্ধতির মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান। সর্বপ্রথম যে সাদৃশ্য এবং মৌলিক সমস্যাটা লক্ষ্যনীয় তা হল – এই দুটি ধারাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে বেশ কিছু ফরয কাজ থেকে বিরত থাকাকে মানহাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হিযবুত তাহরীর যদিও মুখে বলে তারা এই কথা মানে যে বর্তমানে জিহাদ ফারযুল আইন, কিন্তু দল বা জামা'আ হিসেবে তারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আগে জিহাদ না করাকে বেছে নিয়েছে। একইভাবে শাতেমে রাসূলের শাস্তি কিংবা এধরণের কাজের জবাব দেয়াকেও তারা এখন প্রয়োজন মনে করে না। মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা কিংবা দখলদারের হাত থেকে মুসলিম ভূমি মুক্ত করাকে তারা দায়িত্ব মনে করে না। যদিও তারা মুখে বা কাগজপত্রে স্বীকার করে এই কাজ গুলো ফরয কিন্তু কিন্তু জামা'আ হিসেবে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বলে এ সব সমস্যার সমাধান হল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা – আসুন আমরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার কাজ করি। সমস্যা হল, আমরাও স্বীকার করি, খিলাফাহ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আসবে না। কিন্তু তাই বলে ফরয আমলকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। এটা অনেকটা মাসজিদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ফরয সালাত আদায় না করলেও হবে – এরকম বলার মত। সালাত আমাদের উপর ফরয, আমদের তা পড়তেই হবে। মাসজিদ না থাকলে, যেখানে সম্ভব সেখানেই সালাত আদায় করতে হবে- একই সাথে মাসজিদ তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু মাসজিদ নেই, তাই আসুন মাসজিদ তৈরি করি, এই বলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না।

একই অবস্থা জামাত-ইখওয়ানের। এদের মধ্যে ফরয আমল থেকে বিরত থাকা এবং পোস্টপোন [postpone] করার প্রবণতা আরো বেশি। হিযবুত তাহরীর মুখে অন্তত স্বীকার করে এই ফরয আমলগুলোর কথা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জামাত-ইখওয়ানী ধারার ভাইরা এই আমলগুলোর ফরয হবার কথাই স্বীকার করতে চান না। আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, তারিক রামাদানের আদর্শে অনুপ্রাণিত জামাত-ইখওয়ানের যে "লিবারেল" (উদারনৈতিক) অংশ আছে তারা শারীয়াহ সংস্কার (রিফর্ম) এবং "হুদুদ বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য না" এরকম কুফরী আদর্শেও বিশ্বাস করেন। যারা এ ধরণের কুফরী আদর্শ বিশ্বাস করেন না, এমনকি তারাও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার নীতিতে বিশ্বাসী। এই কথার প্রমাণ আমরা মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন যখন ক্ষমতায় ছিল এবং বাংলাদেশে জামাতে ইসলামি যখন ক্ষমতাসীন জোটের অংশ ছিল, তখন তাদের কার্যক্রম থেকে পাই।

এছাড়া ইখওয়ান ও জামাত দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে যা কুফরি ও শিরক। এবং খোদ ইখওয়ানের শায়খ হাসান আল বান্না এবং জামাতে ইসলামের মাওদুদী আজীবন গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। অন্যদিকে হিযবুত তাহরীর "নুসরাহ" পাবার জন্য সামরিক বাহিনীর দ্বারস্থ হয়েছে, যেগুলো দলগতভাবে কাফির বা তাইফাতুল কুফর হিসেবে গণ্য – ত্বগুতের সেনাবাহিনী এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্য জোটের সদস্য হিসেবে।

কিন্তু আমরা যদি এ ব্যাপারগুলো বাদও দেই, সেক্ষেত্রেও এই দলগুলোর পদ্ধতি কতোটা বাস্তবসম্মত?

আসুন আমরা দেখি কোন ভূখন্ডের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর [ইখওয়ান-জামাতি ধারা], কিংবা কোন ভুখন্ডে নুসরাহ পেয়ে খিলাফাহ ঘোষণা দেয়ার পর [হিযবুত তাহরীর] কি হতে পারে।

মূলত ইতিহাসের কোন ছাত্রের পক্ষে জামাত-ইখওয়ানী-হিযবুত তাহরীরের কর্মপন্থা এবং বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য না করে থাকা অসম্ভব। বলশেভিক বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশ্বব্যাপী আদর্শিক আন্দোলন গড়ে তোলা [সমাজতন্ত্র] যা একটি কেন্দ্রীয় কাঠামোর নির্দেশনায় পরিচালিত হবে। এবং একটি ভুখন্ডে সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। বলশেভিক বিপ্লবের ফলে ১৯১৭ তে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিকরা ক্ষমতায় আসে এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের আদর্শিক রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষন, প্রপাগ্যান্ডা বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে সাহায্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয় আর অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশ-দল-আন্দোলনগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের স্যাটেলাইট বা উপগ্রহে পরিণত হয়।

ইখওয়ান-জামাত এবং হিযবুত তাহরীরের ধারার সাথে এই মডেলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। একটি ভূখন্ডে ক্ষমতা অর্জন করা হবে বিপ্লব কিংবা নির্বাচনের মাধ্যমে [বাংলাদেশ, মিশর]। তারপর এই ভূখণ্ড থেকে অন্যান্য ভূখন্ডে অবস্থিত নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হবে। একইভাবে হিযবুত তাহরীরের অবস্থান হল "নুসরাহ"র মাধ্যমে একটি ভুখন্ডে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্জনের পর খিলাফাহ ঘোষণা করা হবে। তারপর বিভিন্ন ভুখন্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের বলা হবে "খিলাফাহর" ভূমিতে হিজরত করতে। অথবা যারা হিজরত করতে পারবে না তারা নিজ নিজ ভূখন্ডের জনগণ এবং সামরিক বাহিনীকে বলবে বাই'য়াহ দিতে।

ধরা যাক, হিযবুত তাহরীর কোন একটি ভুখন্ডে নুসরাহ পেলো। সামরিক বাহিনী তাদের সমর্থন দিল এবং তারা সেই দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো। খিলাফাহর ঘোষণা আসলো। হিযবুত তাহরীরের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান হল খিলাফাহ ঘোষণার জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দুটি দেশ। ধরা যাক, খিলাফাহ ঘোষণা হল পাকিস্তানে। এবার কি হবে?

খিলাফাহ ঘোষণার পর শারীয়াহ অনুযায়ী খালিফাহকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবেঃ

১) সকল মুসলিমের হিজরতের জন্য খিলাফাহর ভূমিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। দুনিয়ার সকল মুসলিমের জন্যই এ সুযোগ থাকবে। এর মধ্যে সেসব মুসলিম থাকবে যাদেরকে অ্যামেরিকা সন্ত্রাসী মনে করে এবং সেসব দল থাকবে যাদের অ্যামেরিকা সন্ত্রাসী দল এবং অ্যামেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করে। খিলাফাহ রাষ্ট্রের ভূমিতে আসা সকল মুসলিমকেই খিলাফাহর নিরাপত্তা দিতে হবে।

২) সকল নির্যাতিত মুসলিমের সমর্থনে এগিয়ে আসা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো একই সাথে সকল জায়াগায় সাহায্য নাও পাঠানো যেতে পারে, কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলে অবশ্যই পাঠাতে হবে। যেমন পাকিস্তানে খিলাফাহ ঘোষণা হলে, অবশ্যই কাশ্মীরে সেনা পাঠাতে হবে। পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানে ন্যাটোর যে সাপ্লাই রুট আছে তা বন্ধ করে দিতে হবে এবং আফগানিস্তানে ন্যাটো/অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে হবে। বাংলাদেশে খিলাফাহ ঘোষণা হলে আরাকান এবং পশ্চিমবঙ্গে সেনা পাঠাতে হবে। একইসাথে যেখানে সেনা পাঠানো যাবে না, সেখানের মুসলিমদের অর্থ, লোকবল এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে হবে, যেমন ফিলিস্তিন, সিরিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন ইত্যাদি। একাজগুলো এখনই মুসলিমদের উপর ফরয। হিযবুত তাহরীর এ কাজগুলো এখন করে না, এই কথা বলে যে এখন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা এগুলোর চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ – খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর এই কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত তাদের থাকবে না। এবং কাজগুলো তাদের করতেই হবে।

৩) যেহেতু তারা বলে এসেছে এটা হল বিশ্বব্যাপী শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি – তাই তাদের এখন বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু এই ভূখন্ডগুলোর শাসকরা অবশ্যই এতে বাধা দেবে এবং তাদের পশ্চিমা মালিকরাও এতে বাধা দেবে সুতরাং শান্তিপূর্ণ কোন পদ্ধতিতে এটা করার কোন সম্ভাবনা নেই। খিলাফাহ রাষ্ট্রকে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম ভূমি মুক্ত করার জন্য জিহাদে নামতে হবে।

যদি এই পদক্ষেপগুলো হিযবুত তাহরীরের "খিলাফাহ" রাষ্ট্র নেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার হবে। যদি আমরা পাকিস্তানে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে ধরে নেই, তাহলে ভারত, এবং অ্যামেরিকা [ন্যাটো] দুটোই "খিলাফাহ"কে আক্রমণ করবে [ভারত করবে কাশ্মীরের জন্য, অ্যামেরিকা করবে সাপ্লাই লাইন, আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ, সন্ত্রাসী দমনের জন্য এবং ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ইস্রাইলের বিরুদ্ধে সহায়তা থামানোর জন্য]। ফলে খিলাফাহ রাষ্ট্র নিজ ভূখন্ডে একটি যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। যে যুদ্ধে শক্তির দিক দিয়ে সে পিছিয়ে আছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং পারমাণবিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ন্যাটো এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির সামনে এই সেনাবাহিনী কনভেনশানাল ওয়ারফেয়ার বা সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। যদি পাকিস্তান থেকে পারমানবিক বোমা ব্যবহার করা হয় তাহলে "খিলাফাহর" ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে যাবে, কারণ সংখ্যা এবং ধ্বংসক্ষমতার দিক দিয়ে অ্যামেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রের সক্ষমতা বেশি। একই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে যদি, পাকিস্তান থেকে প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তবে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব পাকিস্তানের "খিলাফাহ" রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একাট্টা হবে।

যদি পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার না হয়, তাহলে প্রথমে ন্যাটো একটা নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করবে এবং বোমা হামলা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এয়ারফোর্স ধ্বংস করে দেবে। তারপর সম্মিলিত সেনাদল পাঠানো হবে যেরকম আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া কিংবা মালিতে পাঠানো হয়েছে। এই অসমশক্তির ভারসাম্যহীন যুদ্ধে যেহেতু কনভেনশানাল যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী টিকতে পারবে না, তাই কিছুদিনের মধ্যেই অবধারিতভাবেই গেরিলা যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। খালিফাহ এবং তার মাজলিশে শূরাকে রাজধানী ত্যাগ করে দুর্গম অঞ্চলে গোপন সেফ হাউসে চলে যেতে হবে, এবং সেখান থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। চোরাগুপ্তা হামলার নীতি গ্রহণ করতে হবে। যে তামক্কীন বা কর্তৃত্ব অর্জিত হয়েছিল তা হাতছাড়া হয় যাবে এবং বিশ্বব্যাপী শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার বদলে "খিলাফাহ"কে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নামতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার এক দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধে "খিলাফাহ" জড়িয়ে যাবে। "খিলাফাহ" অস্তিত্ব থাকবে শুধুমাত্র নামে, বাস্তবে তা হবে একটি গেরিলা দল।

আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পৃথিবীর যেখানেই শারীয়াহ কায়েম করা হয়েছে অ্যামেরিকা ও তার দোসররা কোন না কোন অজুহাতে সেখানে আক্রমণ করেছে। সোমালিয়া, ইয়েমেন, মালি সব জায়গাতেই এটা হয়েছে। সুতরাং উপরে বর্ণিত পদক্ষেপ যদি নাও নেয়া হয় তবুও শুধুমাত্র শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার কারণে কুফফার আক্রমণ করবে। কিন্তু যদি কেউ নিজেকে খালিফাহ কিংবা নিজেদেরকে খিলাফাত হিসেবে দাবি করে তাদের এই পদক্ষেপগুলো নিতেই হবে। আর এই পদক্ষেপগুলো নিলে তার ফলাফলস্বরূপ অবধারিত যুদ্ধের ফলাফল হল, "খিলাফাহ" একটি গেরিলা দলে পরিণত হবে।

যদি জামাত-ইখওয়ান কোন ভূমিতে ৯৯% ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে, তারপর সেখানে শারীয়াহ কায়েম করে, খিলাফাহ ঘোষণা দেয় এবং উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয় [যদি আদৌ নেয়] তবে তাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। ঘোষনার কিছু দিনের মধ্যেই খিলাফাহ একটি গেরিলা দলে পরিনত হতে বাধ্য হবে এবং শুধুমাত্র নামেমাত্র "খিলাফাহ" থাকবে। যদি তামক্বীন অর্জনের পর এই পদক্ষেপগুলো না নেয়া হয় এবং শুধুমাত্র তামক্বীন প্রাপ্ত অঞ্চলে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা হয়? তাহলে এটি খিলাফাহ হিসেবে গণ্য হবে না, বরং ইমারাহ বলে বিবেচিত হবে – এবং ইমারাতের আমীরের প্রতি বাই'য়াহ খাস হবে এবং 'আম বাই'য়াহ হবে না। মুসলিমদের জন্য ইমারাতের আমীরকে বাই'য়াহ দেয়া ওয়াজিব হবে না। এবং এমনকি ইমারাতের ক্ষেত্রেও নিকটবর্তী অঞ্চলের মুসলিমদের সাহায্য করা ফরয দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে।

সুতরাং আমরা যদি হিযবুত তাহরির কিংবা জামাতের কথা গ্রহণ করি, তাদের পদ্ধতি অনুসরণও করি তাও শেষমেশ আমাদের গেরিলা যুদ্ধেই যেতে হচ্ছে। বেশি থেকে বেশি একটি ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। মাঝখান থেকে "খিলাফাহ" প্রতিষ্ঠার একটি ফাঁকা বুলি প্রচার করা হবে, যা উম্মাহকে আশান্বিত করার বদলে আরো বেশি হতাশাগ্রস্থ করবে। কারণ উম্মাহ দেখবে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যে খিলাফাহ একটি নামসর্বস্ব ঘোষণায় পরিণত হয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের ইমারাহ এবং গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে যেতে হয়, খোদ "খিলাফাহ"র ভূমিতে তাহলে, শুধুমাত্র একটা ঘোষণার জন্য উম্মাহর আশা-স্বপ্ন-ভরসা নিয়ে এরকম করাটা অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় এবং মারাত্বক অবিবেচনাপ্রসূত কাজ। শারীয়াহর কোন কিছুই নামসর্বস্ব হয় না। শারীয়াহর প্রতিটি জিনিস বাস্তবের সাথে সম্পৃক্ত। তাহলে যে রাষ্ট্রের সমগ্র শারীয়াহকে বাস্তবায়ন করার কথা সেটা কিভাবে নামসর্বস্ব হতে পারে?

সশস্ত্র পদ্ধতিঃ

সশস্ত্র পদ্ধতির মধ্যে আমরা তিনটি পদ্ধতি দেখেছি। একটি হল আঞ্চলিক জিহাদী সংগঠনগুলোর পদ্ধতি। যেমন বাংলাদেশের জেএমবি কিংবা মিন্দানাওয়ের মরো লিবারেশান ফ্রন্ট বা লিবিয়ার এলআইএফজি। বর্তমানে এ পদ্ধতিটি বিলুপ্তপ্রায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এধরণের দলগুলো একটা পর্যায় পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু তারপর হয় সরকারগুলো তাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছে [জেএমবি, এলএফআইজি], অথবা ঐ নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তারা আর অগ্রসর হতে সক্ষম হয় নি [মরো লিবারেশান ফ্রন্ট]। সর্বোপরি এই পদ্ধতিটির ফোকাস আঞ্চলিক, কিন্তু খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হল একটি বৈশ্বিক লক্ষ্য। যদি এই পদ্ধতিটি কোনো একটি ভূখণ্ডে সফলও হয়, তবুও তার মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে না। বরং বড়জোর একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি ইমারাহ প্রতিষ্ঠা হবে যা তার নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে।

অন্য পদ্ধতিটি হল আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ [জামাতুল মুসলিমীন], GIA এবং হালের জামাতুল বাগদাদীর অনুসৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে সফল হল জামাতুল বাগদাদী। আত-তাকফির ওয়াল হিজরাহ কিংবা GIA, কোনটাই জামাতুল বাগদাদীর মতো সাফল্য অর্জন করে নি। এই দলটি শুরুতে ছিল তানজীম আল-ক্বাইদার অধীনস্ত একটি ইমারাহ যারা, ইরাকে কর্মকান্ড পরিচালনা করতো। ইরাকেও তাদের অবস্থা বেশির ভাগ সময় ছিল একটি গেরিলা দলের মত। পরবর্তীতে সিরিয়াতে আরো কিছু অংশের উপর তামক্বীন অর্জনের পর তারা নিজেদের খিলাফাহ এবং তাদের আমীরকে খালিফাহ হিসেবে ঘোষনা করেছে। এই ঘোষণার ভিত্তিতে তারা মুসলিমদের তাকফির করেছে, তাদের জান-মাল-সম্মান হালাল করেছে এবং মারাত্মক সীমালঙ্ঘন করেছে। যদি আমরা জামাতুল বাগদাদীর অবস্থার দিকে তাকাই তাহলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, কিছুক্ষন আগে আমরা হিযবুত তাহরীর বা জামাত-ইখওয়ানের সম্ভাব্য "খিলাফাহ"-এর ব্যাপারে যা যা হতে পারে বলে আলোচনা করলাম- তার সব কিছুই জামাতুল বাগদাদীর সাথে বাস্তবিকই হয়েছে। খিলাফাহ ঘোষণার মাসখানেকের মধ্যে তারা ব্যাপক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে এবং আক্রমণ ও আত্মগোপনের [attack and retreat] একটি গেরিলা দলে পরিণত হয়েছে। খোদ তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলেই তারা মুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম না। এমনকি তাদের নেতাদেরকেও তাদের রাজধানী রাক্কা থেকে অ্যামেরিকানরা ধরে নিয়ে গেছে।

পাশপাশি আমরা দেখেছি, জামাতুল বাগদাদী নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য করতে সক্ষম বা ইচ্ছুক কোনটাই না। তাদের কথিত খিলাফাহর কাছেই মাদায়াহ শহরে ৪০,০০০ সুন্নি মুসলিম অনাহারে মারা যাচ্ছে, তারা সাহায্য করছে না, বা সাহায্য করতে অক্ষম। তাদের কথিত খিলাফাহর কাছে

ইরাকের বিভিন্ন জায়গায় রাফিদা শি'আরা সুন্নিদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে, সুন্নি নারীদের ধর্ষণ করছে – তারা সাহায্য করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক| তাদের খিলাফাহর পাশেই পশ্চিম তীরে মুসলিমরা ইহুদীদের হাতে নিহত হচ্ছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, যেসব জায়গায় জামাতুল বাগদাদী উলাইয়্যা ঘোষণা করেছে – যেমন সিনাই, ইয়েমেন, লিবিয়া এবং খুরাসান – এস্থানেও তারা না মুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম আর না শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে। এর মধ্যে মিশরের কারাগারে আজ অসংখ্য মুসলিমাহ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, ত্বগুত সিসি মুসলিমদের হত্যা করছে। ইয়েমেনে "খিলাফাহর" সেনারা আল-ক্বাইদার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে থেকে আল-ক্বাইদার উপরই তাকফির করছে, আর লাখ লাখ মুসলিম অনাহারে ধুকছে। ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রন মানসূর হাদী, হুথি আর আল-ক্বাইদার মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। ইয়েমেনের সাধারণ মানুষ জামাতুল বাগদাদীকেই চেনে না, আর বাগদাদীর গভর্নরকেও চেনে না। খুরাসানে জামাতুল বাগদাদী প্রদেশ ঘোষণা করে বসে আছে, অথচ যারা বাগদাদীকে বাই'য়াহ দিয়েছে তারা হল ওরাকযাই গোত্রের যারা ওয়াযিরিস্তান থেকে আফগানিস্তানে ঢুকে আক্রমণ করে আবার ওয়াযিরিস্তানে ফেরত যায়, তাদের নিয়ন্ত্রনে কোন ভূখণ্ড নেই, আর তারা কোথাও শারীয়াহও কায়েম করছে না। সুতরাং চক্ষুষ্মান সকলের জন্য এটা স্পষ্ট যে বাগদাদীর খিলাফাহ একটি বাস্তবতা বিবর্জিত ঘোষণা মাত্র। তাদের সর্বোচ্চ গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত একটি ইমারাহ বলা যায়, যা ইরাক-সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ন্ত্রন করে। সমগ্র ইরাকের উপর, শামের উপর কিংবা যে যে জায়গায় উলাইয়্যা ঘোষণা করা হয়েছে তার কোথাও তাদের পূর্ণ তামক্বীন নেই। আর নাইবা তারা এসব অঞ্চলের মুসলিমদের কুফফার ও তাওয়াগীতের আক্রমণের মুখে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এরকম একটি দলের নিজেদের খিলাফাহ দাবি করা, তাদের বাই'য়াহ ওয়াজিব দাবি করা-বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত ঘুরেফিরে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ইমারাহ প্রতিষ্ঠার দিকেই যেতে হচ্ছে। আর এটাই হল তৃতীয় সশস্ত্র পদ্ধতি - তানজীম আল-ক্বাইদা তথা শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহর মানহাজ, যা ইতিপুর্বে আলোচিত হয়েছে। হিযবুত তাহরীর-জামাত/ইখওয়ানের তাত্ত্বিক পদ্ধতি তাদেরকে বাধ্য করেছে ফরয আমল ছেড়ে দিতে। পাশপাশি তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে এতে যদি তারা কোন অঞ্চলে সফলও হয় তবে তাদের অবধারিত ভাবে গেরিলা যুদ্ধের মডেলে যেতে হবে। আল-ক্বাইদা আগে থেকেই এই মডেল গ্রহণ করেছে এবং ফারযিয়্যাত পালন করছে। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদী নিজেদের ইমারাহকে খিলাফাহ বলে দাবি করলেও এতে বাস্তবতা বদলায়নি। বরং জিহাদী আন্দোলনের মধ্যে ফাটল ধরেছে, ইরাক ও শামের মুসলিমদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকফির ও গুলুহর ভয়ঙ্কর রকমের প্রসার ঘটেছে এবং কুফফার উপকৃত হয়েছে। আর এসব কিছুর পর, জামাতুল বাগদাদী গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত একটি ইমারাহই আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদ্ধতির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ঐ

উপসংহারেই আসতে হচ্ছে যা আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ ও আল-ক্বাইদা গ্রহণ করেছিলো। আর এটাই এই মানহাজের শ্রেষ্ঠত্ব, কার্যকারিতা, সফলতা এবং বাস্তবসম্মতা প্রমাণ করে।

আগামী পর্বে তানজীম আল-ক্বাইদার মানহাজের বিস্তারিত পর্যালোচনা, সাফল্য এবং উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় দিকগুলো আলোচনার করা হবে ইন শা আল্লাহ্।